সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৮

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৮

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

১৮৫৪—১৯০৫

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—১০।২।১৯৪৪

জন্ম ; ছাত্র-জীবন

৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্ত্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—মাধবচন্দ্র বসু ; নিবাস—দামোদর-তীরবর্ত্তী বেড়ুগ্রামে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে এফ. এ. পড়িতে থাকেন, কিন্তু পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় তিনি জনাই স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কিন্তু চাকুরীতে তাঁহার মন বসিল না ; দুই-আড়াই মাস পরেই তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদে গিয়া আইন পড়িতে লাগিলেন। তিনি আইন-পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেন নাই।

কর্ম্ম-জীবন

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা

এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র সংবাদপত্র-সম্পাদন-ব্রত গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি চুঁচুড়ার 'সাধারণী' পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট সংবাদপত্র সম্পাদন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ২৬ বৎসর বয়সে, বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সহযোগে তিনি কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 'বঙ্গবাসী'র

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ (১০ ডিসেম্বর ১৮৮১) তারিখে। প্রকাশক-রূপে উপেন্দ্রবাবুর নাম পত্রে মুদ্রিত হইত। 'বঙ্গবাসী' শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্র-রূপে পরিণত হইল। ইহা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মফস্বলে সংবাদপত্র বলিতে 'বঙ্গবাসী'কেই বুঝাইত। কয়েক বৎসর পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, উপেন্দ্রবাবু বঙ্গবাসীর সংস্রব ত্যাগ করেন। 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

কেবল 'বঙ্গবাসী' কেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন; এগুলি—'হিন্দী বঙ্গবাসী', বাংলা 'দৈনিক' ও ইংরেজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ'।

'জন্মভূমি'

একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশও যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। ১২৯৭ সালের পৌষ মাসে 'জন্মভূমি' নামে মাসিকপত্র "বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" হয়। এই মাসিকপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়:—

> সূচনা।—...আমরা অনেক দিন হইতে একখানি প্রথমশ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম;—কারণ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস ভাল মাসিকপত্র ব্যতীত লোকশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সংবাদ-পত্রে লোকের অর্দ্ধ শিক্ষা হয়, মাসিকপত্রে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামনা অন্তরে রাখিয়া, আমরা মাসিকপত্র প্রকাশার্থ প্রথম কল্পনা করি;...

৯ম ভাগ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র ১৩০৫) পর্য্যন্ত 'জন্মভূমি' বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর উহা

হস্তান্তরিত হয়, এবং নবপর্য্যায়ের 'জন্মভূমি' ৯ম ভাগ—৯ম বর্ষ (১৩০৭ শ্রাবণ—১৩০৮ আষাঢ়) নরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

শাস্ত্রপ্রকাশ

যোগেন্দ্রচন্দ্রের আর একটি কীর্ত্তি—বাঙালীর প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ স্থলভে প্রচার। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ-উপপুরাণ, স্মৃতি-তন্ত্রাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ সহ তিনি নাম-মাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বহু ইংরেজী গ্রন্থও তিনি পুনর্মুদ্রণ করিয়াছিলেন।

স্বরচিত গ্রন্থ

যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বরচিত কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক গল্প ও উপন্যাসও বেনামীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। **মডেল ভগিনী**

১ম ভাগ,	৪ শ্রাবণ ১২৯৩ [২৯ জুলাই ১৮৮৬]	পৃ. ১৪১
২য় ভাগ,	১২ আশ্বিন ১২৯৩ [১ অক্টোবর ১৮৮৬]	পৃ. ১৭৩
৩য় ভাগ, ১ম অংশ	১ আষাঢ় ১২৯৪ [২৫ জুন ১৮৮৭]	পৃ. ২৩১-৪৭১
২য় অংশ	[১০ অক্টোবর ১৮৮৭]	পৃ. ১৪৬
৪র্থ ভাগ,	১২৯৫ (?) সাল	

১২৯৩ সালে ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম তিন ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়—২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে। প্রথম

চারি ভাগ একত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন ১২৯৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে দেখিতেছি।

২। **বাঙ্গালী চরিত।**

প্রথম ভাগ, ১২৯২ সাল। পৃ. ১০৮।
দ্বিতীয় ভাগ, ১২৯২ সাল। পৃ. ১০০।
তৃতীয় ভাগ, ১২৯৩ সাল। পৃ. ১১৮।

৩। **চিনিবাস চরিতামৃত।** ? [২৭ জুন ১৮৮৬] পৃ. ২৭০।

৪। **মহীরাবণের আত্ম-কথা।** ১২৯৫ সাল। পৃ. ৫৭।

৫। **কালাচাঁদ।**

১ম-২য় পর্ব্ব। [২ ডিসেম্বর ১৮৮৯] পৃ. ১৮২।
৩য় পর্ব্ব। [২০ জানুয়ারি ১৮৯০] পৃ. ১৮৩-৩১৫।
৪র্থ পর্ব্ব। ১২৯৬ সাল [২২ মার্চ ১৮৯০] পৃ. ৩১৭-৫৩৭।
৫ম পর্ব্ব। (অসম্পূর্ণ) [১৭ মে ১৮৯০] পৃ. ৫৩৯-৬৮২।

'কালাচাঁদে'র এই পাঁচ পর্ব্ব পরে একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। **কৌতুক-কণা।** ১৩০৭ সাল। পৃ. ৯৬।

সূচী :—মোহন বাঁশী, আমার উপন্যাস, দার্জলিঙ যাত্রা, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা, ৺পূজার বাজার, নূতন উপন্যাস, পঞ্চানন্দ। (নহে।)

৭। **নেড়া হরিদাস।** অগ্রহায়ণ ১৩০৮। পৃ. ২৮১।

গ্রন্থকার "মুখবন্ধে" লিখিয়াছেন :—

নেড়া হরিদাস, বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্ভাগবত ;—পাষণ্ডদলনের নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকাশিত।

অপধর্ম্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে,—সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

মায়াবি-নিশাচরের মায়াজাল,—হরিণ-শিশুকে চিনাইয়া দিবার জন্যই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের মর্ত্ত্যে আবির্ভাব।

পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মচন্দ্রের কলঙ্ককালিমা মোচনার্থ এ নেড়া-হরিদাস গ্রন্থ বিরচিত।

নানা স্থানে ধর্ম্মের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-দোকানদারের দোকান বন্ধ করিবার নিমিত্তই এই নেড়া-হরিদাস গ্রন্থের উৎপত্তি।

৮। **শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।**

'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র ৩য় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ পয্যন্ত 'জন্মভূমি'তে (পৌষ ১৩০২—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিন ভাগ একত্রে (পৃ. ৫২৮) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১৫ জুন ১৯০২ তারিখে। ইহার আরও তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মৃত্যু

কঠিন পরিশ্রমের ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। ১৮ আগস্ট ১৯০৫ তারিখে ৫০ বৎসর ৭ মাস বয়সে মধুপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

যোগেন্দ্রচন্দ্রের গ্রন্থগুলি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। এগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন :—

…তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকগুলি বিদ্রূপাত্মক। অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির বিশ্বাস যে, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল নরনারীকে দন্তবিকাশে পটুতালাভ করাইবার জন্য ; কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস। ধর্ম্মোপদেষ্টা অন্বয়মুখে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন, ব্যঙ্গরসিক ব্যতিরেকমুখে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করেন। উভয়ের একই সাধু উদ্দেশ্য, প্রণালী স্বতন্ত্র।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্মে ভেল, আমাদের কর্ম্মে ভেল, আমাদের সমাজসংস্কারে ভেল, আমাদেব সাহিত্যসাধনায় ভেল, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভেল, আমাদের বিজ্ঞাপনে ভেল, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ভেল, আমাদের দেশহিতৈষণায় ভেল। তাই তিনি সাহিত্যগুরু ইন্দ্রনাথের ন্যায়, এই ভেল নিবারণের জন্য, এই ভেল উড়াইবার পুড়াইবার তাড়াইবার ছাড়াইবার জন্য, সুতীব্র বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেন। সেই চোখা চোখা শরে অনেক রকম ভণ্ডামি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও বোধ হয় অনেকগুলি ভেল 'মরিয়া না মরে।' শুনিয়াছি, ফরাসী নাটককার মোলিয়ার একটি একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে এক একখানি বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখিতেন। আর বিদ্রূপবাণে জর্জ্জর হইয়া কুপ্রথাটি প্যারিস-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইত। ডিকেন্‌সের নভেলেও ইংরাজ-সমাজের অনেক কুপ্রথাব উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে ; কিন্তু ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ লেখনী আমাদের চক্ষু ফুটাইতে পারে নাই। ইহা কি মোলিয়ার ডিকেন্‌সের তুলনায় ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের অক্ষমতার পরিচায়ক ? শতবার বলিব, কখনই নহে। আমরা যে 'গণ্ডারবেদী' তাই আমাদের সমাজে পড়িয়া হীরার ধারও ভাঙ্গিয়াছে।…
('সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র')

যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রধান কীর্ত্তি 'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; এই 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠান বাংলা-সাহিত্য ও সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সাহিত্যে বঙ্গবাসী একটি স্বতন্ত্র রচনার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত আদর্শ হইতে ইহা স্বতন্ত্র ; বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের আদর্শ গোঁড়ামি-দোষদুষ্ট হইলেও ইহাতে খাঁটি বাঙালিয়ানার প্রতি নিষ্ঠা আশ্চর্য্য রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। 'বঙ্গবাসী' স্কুলের এই সকল রচনা ব্যঙ্গে ও হাস্যে সমুজ্জ্বল, বাঙালীর হৃদয়মনের সহজবোধ্য , গল্প বলার এরূপ অপরূপ ভঙ্গী পরবর্ত্তী কালে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি বহু সক্ষম লেখক এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালী পাঠকের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। আমরা এখানে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া তাঁহার রচনারীতির পরিচয় দিতেছি। যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তারিত সন্ধান জানিতে চান, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে হইবে।

'মডেল ভগিনী' ঃ—

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব-পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে ; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে, তপন-সোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী, প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মহান্তের হাতীটা অতি গরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া

জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল,···ঘাম বাহিরিল,—কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর তো আগুনের খাপ্‌রা। টীনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চুণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হল্‌দে রঙ, সেগুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তা-চাপা-অসূর্য্যম্পশ্য-নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।

বড় সুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ী যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই ঐ হরিতাল-রঙে একটু "নিকন পোঁছান" করিয়া, তাহার ভাড়া বাড়ান হইতেছে। বাড়ী পড় পড়; বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে; ছাদ ফাটিয়াছে, কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটী হইতে দুচার দিনের মধ্যে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা আসিবে। ওমা! পনের দিন পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্ত্রি, সেই হরিতালী রঙ, হাঁড়া হাঁড়া গুলিয়া হুহু শব্দে তাহার অষ্টপৃষ্ঠললাটে মাখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে, দিব্য ফুট্‌ফুটেটী হইল। তখন বাড়ীর কর্ত্তা, প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমার ইচ্ছা, (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল) দশ টাকা বাড়াইয়া, চল্লিশ টাকা করি। গিন্নী বলেন, তা হবে না; পঞ্চাশ টাকার কম এবার

ও-বাড়ী ছাড়া হবে না।" পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রঙে ছোপান পুরাণ কাপড়ের কাঁচুলি-কসনে, ডবল বিজিটের দাবী করে।

* * *

সেই প্রকাণ্ড হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবার যো নাই। উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয় ঈষৎ উর্দ্ধে উত্থিত এবং নিতম্বপ্রদেশ নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত। ফল কথা, শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আঙরাথায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুমসুকুমার, মাখমে-গড়া, গৌরাঙ্গখানি, কার অভিশাপে, কি দোষে, ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেন,—না জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে।

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এষ্টাকিন্!! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, এষ্টাকিন্ এঁটে ব'সে থাক্‌তে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওর কোন একটা বিলাতী ব্যারাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদের শরীরে একটা না একটা রোগ লেগে আছেই। আহা! বড় ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের

একতিল বিচ্ছেদ নাই; কাজেই ওঁদের একটুতেই অসুখ করে। মা-লক্ষ্মীর দোষ কি? দোষ যত, তা আমার পোড়া কপালের!

হুহু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে, জানালায় জলময়ী খস্‌খসের পরদা! তবু কেন তিনি পায়ে এণ্টাকিন্ এবং গায়ে জামা দিয়া ঘাম বাড়াইতেছেন?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধনুকের ছিলার মত সুতীক্ষ্ণটানবিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায় কাপড়ও তো নাই। কেশকলাপ কেদারা ডিঙ্গাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্ব্বাঙ্গে ঘেরাটোপ; মাথাটী খোলা; এই বা কেমন লজ্জা? আর, এ নির্জ্জনে লজ্জাই বা কাকে? বিধাতার বিচিত্র লীলা বুঝিতে পারিলাম না!

* * *

দূরেই সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি। নিকটে গেলেই খেঁদা নাক, মুখে বসন্ত-খেকো দাগ, ঠোঁট পুরু, দাঁত উঁচু, চোখ বসা—এ সমস্ত স্বভাবের শোভাই দৃষ্টিগোচর হয়। শেষে ঘৃণা উপস্থিত হয়। মনে হয়, এঃ, এর জন্যেই এত যত্ন, এত পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা মরিলাম!—ছি! ছি! অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে কি ছোট, কি বড, কি মাঝারি, কি উত্তম, কি অধম—সর্ব্ববিষয়েই এ নিয়ম খাটে!

দূর হইতে চাদর ধরিয়া টানাটানি দেখিয়া, এই যে আমরা মনে মনে কতই সুখ-কল্পনা করিতেছিলাম, কতই আনন্দ-কৌতূহল উদ্দীপিত হইতেছিল, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম, সব ভোঁ-ভোঁ!—কোথাও কিছুই নাই,—তিনটি লোক পরস্পর হাসি-তামাসা করিতেছে! আমরা মারামারির মজা দেখিব বলিয়া দৌড়িয়া আসিলাম!—দেখিলাম কি না, —হাসি-তামাসা, ভাব-ভালবাসা! ভাবিয়াছিলাম, মারামারিতে একটা লোক আধখুন হবে,—কনষ্টেবল এসে দুটাকে চালান দিবে, একটা ছট্‌কে

পালাবে,—আর আমরা এই আশদ্ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখ্‌বো!—এমন ধারা ঘটনাটি হ'লে ত মনে সুখ হতো! —তাই ছাই না হয়, একটু কম করেই মারামারি হৌক!—কিন্তু এ যে মূলে ফাঁক! উল্টাস্রোত! পোড়া অদৃষ্টে কি বিধাতা সুখ লেখেন নাই?

* * *

উনবিংশ শতাব্দী—বন্ধুত্বের কাল;—প্রীতি, পবিত্রপ্রণয়, ভাব-ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু, কাহন-কাহন মেয়ে; মেয়ের বন্ধু, কাহন-কাহন পুরুষ। কাহারো কথাটি কহিবার যো নাই, —ভবের হাটে বন্ধুত্বের বেচা-কেনা একৃসা চলিয়াছে। চলুক। এই চরম সভ্যতার ঢেউ কোথা গিয়া লাগে, দেখা যাক্।

কমলিনী চরম সভ্যা। মার্কিন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গূঢ় রস একত্র মিশাইয়া কমলিনী এক নিশ্বাসে পান করিয়াছেন। তাই কমলিনীর অগাধ বন্ধু; অসংখ্য সুহৃদ; অপরিমেয় মিত্র। আকাশের তারা, মরুভূমির বালি, বটগাছের পাতা গণিতে পারি,—কিন্তু কমলিনীর বন্ধু গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।

কমলিনীর নানাজাতীয় নানাশ্রেণীর বন্ধু! হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, বেম্ম—সকলেই তাঁহার বন্ধু-দলভুক্ত। তাঁহার ছোক্‌রা বন্ধু, যুবা বন্ধু, বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু, বারিষ্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, ডেপুটী বন্ধু, বি এ পাস বন্ধু, কলেজের এল এ ক্লাসের ছাত্র বন্ধু, দেওয়ান বন্ধু, পণ্ডিত বন্ধু, মূর্খ বন্ধু। তাঁহার খান্‌সামা বন্ধু, দোকানদার বন্ধু, দারোয়ান বন্ধু। তাঁহার ঘোষ-বসু-মিত্র বন্ধু, চাটুয্যে-মুখুয্যে-বাঁড়ুয্যে বন্ধু, রায়-সরকার-দে বন্ধু। তাঁহার তেলী-মালী-তামুলী বন্ধু, তাঁতী-জোলা-যুগী বন্ধু, হাড়ী-ডোম-চণ্ডাল বন্ধু, মুচি-মুদ্দফরাস-মড়ুইপোড়া বন্ধু। তাঁহার কুকুর-শেয়াল-বিড়াল বন্ধু, ছাগল-ভেড়া-গরু বন্ধু, হাঁস-মুর্গী-বক

বন্ধু। তাঁহার হাতী-ঘোড়া-উট বন্ধু, মহিষ-গণ্ডার-হরিণ বন্ধু, বাঘ-ভালুক-সিংহ বন্ধু। তাঁহার কলা-মূলা-বেগুন বন্ধু, ফুটী-তরমুজ-শশা বন্ধু, ঝিঙে-উচ্ছে-করলা বন্ধু। তাঁহার ওল-কচু-মান বন্ধু, বাঁশ-বাবলা-শেয়াকুল বন্ধু, অশ্বত্থ-বট-ঝাউ বন্ধু। তাঁহার পাহাড়-পর্ব্বত-পাথর বন্ধু, ঝোপ-ঝাপ-জঙ্গল বন্ধু, ঘোপ-ঘাপ-গুহা বন্ধু। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বন্ধুময়। কত আসে কত যায়, কত থাকে—তাহার নির্ণয় করে কে ?

একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ গণৎকার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,—এই কলিকাতা সহরমধ্যে কমলিনীর এক শত আট জন বারমেসে বাছাই বন্ধু আছেন। তন্মধ্যে আজ বত্রিশ জন মাত্র নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম জালে ছাঁকিয়া, অদ্য এই বাছায়ের বাছাই বন্ধুগুলি মিলিত হইয়াছেন।

কমলিনীর তিন রকম মূর্ত্তি আমরা দেখিলাম। হুগলীতে গঙ্গা-উপকূলে এক মূর্ত্তি, শ্রীবৃন্দাবনে এক মূর্ত্তি, আর অদ্য কলিকাতায় এই অপরূপ মূর্ত্তি। চরম !

'বাঙ্গালী-চরিত' ঃ—

সেই একদিন, আর এই একদিন। সে দিন সেই পূর্ণিমা তিথি, ষোলকলা শশী, সারদ-কৌমুদীরাশি ; আর আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকার, মেঘের হুঙ্কার, বিদ্যুতের বিকট হাসি, উনপঞ্চাশ্ পবনের বিষম বিক্রম,—আর বাঁচি না, আর তিষ্ঠিতে পারি না। সে দিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ-প্রতিমা দেখিয়াছি,—মূর্ত্তিমতী সরলতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, মূর্ত্তিমতী গৃহকর্ম্ম, মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী, সে দিনও দেখিয়াছি—কিন্তু আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজড় হয় কেন ? কেন এমন হইল ? বাঙ্গালীর ঘরণী বিলাসিনী কেন ?

আড়-নয়ন খেমটা নাচে কেন? চারু হাসিতে বিষ মাখাইল কে? কথামৃতে ছাই ফেলিল কে? ঘোমটা লুকাইল কে? গৃহলক্ষ্মীকে বাইজী সাজাইল কে?

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে, কালবশে, যুগধর্ম্মে, সমাজ-শরীরে মহাবিষ পশিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না—চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, সংজ্ঞা থাকিতে অচেতন। যেন দিগ্বিজয়ী যাদুকরের অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ায় দেশ মজিয়াছে! অহো কি বিড়ম্বনা! সিংহ শৃগালের ডাক শিখিতেছে, স্বয়ং সুরভি শূকরের পন্থা অনুসরণ করিতেছে, দেবতা পিশাচের খেলা খেলিতেছে।

ম্লেচ্ছ-অধিকারে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে! এই "স্ত্রীশিক্ষাই" সর্ব্বনেশে জিনিষ; তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের, সোহাগের, সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল-প্রসবিণী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ;—ইহাই যেন হাতের নোয়া, সীঁথির সিন্দুর; ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম; ইহাই সংসারের সার-সর্ব্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্যা। বরং একদিন, দশদিক উজ্জ্বলীকৃত, কহিনুরবিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তথাচ এ "শিক্ষা"-টুকু ছাড়িতে পারি না। অধিক কি, বরং বিধবা হইয়া বার মাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না।

এমনি ঝোঁক, এমনি মোহ, এমনি উন্মত্ততা!

পুরুষেরই কি, আর স্ত্রীলোকেরই কি,—কাহারও সু-শিক্ষার বিরোধী আমরা নহি। তবে সু-শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝি না,—বিকৃত ভাবে বুঝিয়াছি,—ইহাই রোগের প্রধান মূল কারণ। বীভৎস শিক্ষাকে

সুশিক্ষা বলিয়া বুঝিয়াছি, কণ্টক-তরুকে চন্দন-বৃক্ষ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছি, পাথরকুঁচাকে চারু-চিন্তা মাণিক বলিয়া বাক্সে তুলিয়াছি! তাই দুর্দ্দশার আদি, অন্ত, মধ্য নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে,—অদ্য এ বিষয় লইয়া সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি,—কেবল অক্ষর চিনিয়া বই পড়িলেই "শিক্ষিত" হয় না। বর্ণজ্ঞান-শূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন, আবার এ দিকে, ইংরেজী-বাঙ্গালায় আউট হইয়াও, অনেক নরনারী নিদারুণ অশিক্ষিত। শিক্ষার অর্থ,—বস্তুর স্বরূপজ্ঞান,—পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অক্ষর পরিচয় না হইলেও তিনি শিক্ষিত। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মে নাই, তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে—আইসলণ্ডস্থ হেক্‌লা পর্ব্বতে উঠিয়া X. Y. Z. পাস করিয়া আসিলেও—অশিক্ষিত! শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহ লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হইয়াও, শিক্ষিত নামে বাচ্য হইতে পারেন। তথাচ কেবল এম, এ, বি, এল, পাস করিয়াও আমাদের ঘোষ, বসু, মিত্র,—বাড়ুয্যে, মুখুয্যে, চাটুয্যেগণ নিতান্ত অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষার অর্থ—কার্য্যশিক্ষা,—শিক্ষা. পুঁথিগত বিদ্যা নহে,—টেয়াপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্য্য শিক্ষায় বুঝে,—ইহা ব্যতীত হিন্দুর অন্য শিক্ষা নাই। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম—ইহাই হিন্দুর একমাত্র কথা। যিনি বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী, তিনি বেদ পাঠ করুন—ইহাই হিন্দুর উপদেশ। অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? অধিকারিভেদে শিক্ষাভেদ। নচেৎ ভস্মে ঘৃত-ঢালাবৎ শিক্ষা নিষ্ফলা হয়। (পৃ. ২৫৭-৫৯)

'কালাচাঁদ' ঃ—

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন, "এ সংসারে জুয়াচোর, শঠ, প্রবঞ্চক কে নয়?—কেবল আমিই কি ধরা পড়িয়াছি?—চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না কয়? বঞ্চনা কাহাতে নাই? তবে বড়লোকে ধরা পড়ে না; আমার মত ছোট লোকেই ধরা পড়ে। দূর-সম্পর্কীয় আমার মেসো, নাজীর; ঠাকুরদাদা, সেরেস্তাদার; এ দুজনের পসার-প্রতিপত্তি, ধুমধাম দেখে কে? লোকে উভয়কেই ধর্ম্মাবতার বলিয়া নমস্কার করে, প্রণাম করে। কিন্তু এ দুজনেই কি জুয়াচোর, বঞ্চক নহে? মেসোর মাহিনা ৩০৲ টাকার অধিক নয়; কিন্তু তাঁহার বাসায় দুই বেলা ৪০ খানি পাত পড়ে। মাসীর গায়ে প্রায় দুই হাজার টাকার গহনা। বাটীতে প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব হয়। মেসো, সম্বন্ধীর নামে তালুক কিনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, মেসো এত টাকা পান কোথা? নিশ্চয়ই চুরি-করা ধন। ছোট-লোকে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, আর বড়-লোকে কথার কৌশলে, বুদ্ধির জোরে চুরি করে। আমরা অসভ্য চোর; তাঁহারা সভ্য চোর। মেসোর বাসায় দুই জন নাপিত-পেয়াদা, খানসামা;—দুই জন ব্রাহ্মণ-পেয়াদা, রসুয়ে। তাহারা মাহিনা খায়—কোম্পানীর; কিন্তু কাজ করে মেসোর। এ সব কথা সকলেই জানে—অথচ, মেসোর জেল হয় না কেন? ঠাকুরদাদার অবস্থাও তথৈবচ। তাঁহার গ্রাম্য-খড়ো-ঘর আমার ত অবিদিত নাই,—আজ তাঁহার চকমিলন বাড়ী! প্রত্যহ সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির সময় নহবদ বাজে। কেহ কেহ বলে, ঠাকুরমার নামীয় কোম্পানির কাগজ আড়াই লক্ষ উপচাইল। জুয়াচুরি ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আইসে? ঠাকুরদাদা ত আর পরেশপাথর কুড়াইয়া পান নাই যে, ঠেকাইলেই সব সোণা হইয়া যাইতেছে!! ঠাকুরদাদা যে প্রত্যহ

সন্ধ্যাকালে কাছারি হইতে আসিবার সময় চাপকানের বুকপকেট-পূর্ণ টাকা এবং নোট লইয়া আইসেন, হাকিম বাহাদুর কি তাহা দেখিতে পান না? তবে সে কিসের হাকিম? সে কিসের বিচারক? যে এত অন্ধ, তাহাকে উচ্চ বিচারাসনে বসান কেন?

"আর উকিল মোক্তারই বা কি? যত ফেরেফ ফন্দি,—সব ইহাঁদেরই হাতে। এমন অকথা, কু-কথা নাই যে, ইহাঁরা মক্কেলকে উপদেশ দিয়া না থাকেন। একই আইনের একদিন একরকম অর্থ হইল,—আবার সুবিধামত, অন্য দিন সেই আইনের অন্যরূপ অর্থ হইল। হাকিমকে ঠকানো, হাকিমের চক্ষে ধূলা দেওয়া, ইহাদের ব্যবসা। মনে করুন, আমি উকীল, আমার হাতে মোকদ্দমা কম,—একটী মোকদ্দমা লইয়া, হাকিমের কাছে বাজে বক্তৃতা করিয়া, সেই একদিনের মোকদ্দমায় দশ দিন করিলাম। মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, মক্কেল দোষী, এ দিকে বক্তৃতার সময় হাকিমকে বুঝাইলাম, মক্কেল নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! এ কি রকম কাজ বুঝি না,—এ কি রকম ধর্ম্ম জানি না, এ কি রকম সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম হয় না!

"আর বিচারপতি হাকিমই বা কি?—নাজির তাঁহার বাজার-সরকার। নাজিরবাবু যেমন সস্তায় জিনিষ কিনিতে পারেন, এ ত্রিভুবনে তেমনটী আর কেহই পারেন না। ঘৃত টাকায় দেড় সের,—কিন্তু নাজির কেনেন, এক টাকায় তিন সের। বাজারে চারি আনা মাছের সের; কিন্তু নাজির মহাশয় দশ সের মাছটা অনায়াসে এক টাকায় লইয়া আসেন। হাকিমের চক্ষে সাক্ষী দুইপ্রকার,—দুয়ো আর সুয়ো। কোন সাক্ষীকে ধমক দিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া, তাহার এজেহার লইতেছেন; সাক্ষী এক কথা বলিলে অন্য কথা লিখিতেছেন, অথবা তাঁহার মনোমত কথা না বলিলে তাহা লিখিতেছেন না। বিচার ঠিক

হউক, আর নাই হউক,—সে দিকে বিচারকের দৃষ্টি নাই ;—কিসে উপর আদালতে তাঁহার রায় বজায় থাকে,—ইহাই তাঁহার চেষ্টা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কে বুঝে, জাল-জুয়াচুরি কে বুঝে,—রায় বজায় থাকিলেই, চাকুরি বজায়,—পদোন্নতি !—সেইটা ঠিক থাকিলেই হইল।

"ব্যবসায়িগণের ত মিথ্যা কথার ব্যবসা। কাপড়ের দোকানে যাও, লম্বোদর ভদ্র দোকানদার বলিবে, "মহাশয়! গঙ্গাদরিমানে বলিতেছি এ কাপড় জোড়াটী ৩৵১০ টাকায় খরিদ—তা, আপনার নিকট চারি গণ্ডা পয়সার বেশী লাভ লইব না।" শেষে, এক ঘণ্টা—কষাকষি, মাজামাজি, হেস্তাহেস্তিতে ২৸৹ টাকায় দোকানদার কাপড় বিক্রয় করিল। দশ গজ থান কেনো,—ঘরে আসিয়া মাপো, সাড়ে নয় গজের অধিক হইবে না। ইহারা কি চোর বঞ্চক নয় ?—তবে আমি একলা কালাচাঁদ ধরা পড়ি কেন ? সমাজের অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি যে কি অধিক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা ত আমি বুঝি না। সকলেই জানে, গোয়ালা দুধে জল দেয় ; এ তত্ত্ব হাকিম, উকিল, জমীদার, রাজা সকলেই অবগত আছেন। এ প্রবঞ্চনা-অপরাধের জন্য সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না কেন ? প্রকাশ্যত পথে পথে ফেরিকর অবিরত চীৎকার করে, 'চাই, ভালো আম্! খাসা মিষ্টি আম্' ; ফেরিকর ডাকিয়া, আম্ কাটিয়া, চাকিয়া দেখ,—টক্ আমড়া তার কাছে কোথায় লাগে ? এইরূপ কত শত মূর্ত্তিমান্ প্রবঞ্চক প্রত্যহ রাজপথে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রবঞ্চনা-গীত গাহিতে গাহিতে হেলিয়া-দুলিয়া হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যায়,—তাহার সংখ্যা কে করিবে ?—কিন্তু ইহাদিগকে কারাগারে পাঠান হয় না কেন ?"

'মহীরাবণের আত্ম-কথা' ঃ—

কি করি? কোন্ দিকে যাই? কোন্ পথ ধরি?

গ্রন্থকার হইব, না পেটেণ্ট-ঔষধের বিজ্ঞাপন দিব? উঁহু,—খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র প্রকাশ করি না কেন? তাতে কি সুবিধা হবে? আচ্ছা,—রাজনৈতিক-বক্তৃতা এবং সেই সঙ্গে একটী ইংরেজী-স্কুল স্থাপন করিলে চলে না কি? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিয়া ধর্ম্মনৈতিক সন্ন্যাসী সাজা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নয় কি? আমার চলে কিসে? আমি করি কি?

বেশী বয়স বলিয়া গবর্ণমেণ্ট চাকুরি দিল না; হাতের লেখা খারাপ বলিয়া সওদাগর আফিসে স্থান পাইলাম না; ব্যাকরণে কম-দখল-হেতু মাষ্টারি হইল না; জমাখরচ বোধ না থাকায় গোমস্তাগিরি হইল না; একটু হাতটান বলিয়া বিল-সরকারী জুটিল না; টেড়ি কাটি বলিয়া খানসামাগিরি মিলিল না। অল্প উপর-নজর আছে বলিয়া কাহারও বাসায় স্থান পাই না; বিষম অভিমান এবং লজ্জাবোধ আছে বলিয়া, মুটেগিরিও করিতে পারি না। (পৃ. ১-২)

'কৌতুক-কণা' ঃ—

বাবু মোহনবাঁশী বি, এ, ফেল মহোদয়ের নিবাস আপাতত কলিকাতায়। পিতা সব্‌জজ ছিলেন,—কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান,—সুতরাং বাঁশীবাবুর অন্নচিন্তা ছিল না। সংসারে তাঁহার মা, স্ত্রী এবং এক কন্যা ছিল। বাঁশীবাবু বহুকাল হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন;—কিন্তু সে পরীক্ষা-সাগর কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এমতে প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাকে 'বি, এ,-ফেল' উপাধি প্রদান করেন। সুতরাং অধুনা তাঁহার নাম দাঁড়াইয়াছিল,—"বাবু মোহনবাঁশী বি, এ,-ফেল।"

মোহনবাঁশীর ধারণা ছিল,—তিনি পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণবান্, জ্ঞানবান্ এবং বুদ্ধিমান্। সেকেলে পিতা কেরাণীগিরি হইতে মাষ্টারি, মাষ্টারি হইতে মুন্সেফী, অবশেষে মুন্সেফী হইতে ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া সব্-জজরূপে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠেন। অল্পবুদ্ধিধারী পিতা যখন এত উচ্চপদ পাইয়াছিলেন,—অগাধ-বুদ্ধিধারী পুত্র তখন সহজেই যে হাইকোর্টের জজ হইতে পারিবেন,—তৎপক্ষে বাঁশীবাবুর কোনও সংশয় ছিল না। সংশয় ছিল না বলিয়াই, বাঁশীবাবু পঠদ্দশায় বন্ধুবান্ধবগণকে বলিতেন,— "মনে কর, হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া মাসে আমি আট নয় হাজার টাকা করিয়া পাইতেছি;—এমন সময় বড়লাট আমাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বল দেখি, এ সময় আমি কি উত্তর দিব? হাইকোর্টের জজের মাসিক মাহিনা বড়-জোর না হয় চারি হাজার টাকা। কিন্তু আমি এদিকে ওকালতীতে মাসে আট নয় হাজার টাকা রোজগার করিতেছি। করি কি? তবে জজিয়তিতে সম্মান অধিক। কি বল,—হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণ করা উচিত নয় কি?"

শুধু বন্ধু বান্ধবকে এ কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। পঠদ্দশায় একবার তিনি ইংরেজীতে একটী "এসে" লেখেন—"উচ্চপদের সম্মান অধিক, না, টাকার সম্মান অধিক?" এ প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করেন, উচ্চপদেরই সম্মান অধিক। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "যথা,—হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিলদের ও বারিষ্টারদের অপেক্ষা জজেদের সম্মান অধিক। কেন না, জজ সাহেব বেলা এগারটার সময় আদালত-গৃহে উপস্থিত হইলে, যত উকীল এবং বারিষ্টার তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না জজ বসেন, ততক্ষণ তাঁহারা কেহ বসিতে পান না।"

ক্রমশঃ কিন্তু মূলে ফাঁক হইয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষক মূষিকগণ,

মোহনবাঁশীরূপ মহান্ মহীরুহের মূল-শিকড় কাটিয়া দিল। উপর্য্যুপরি সাত বার তিনি বি, এ, ফেল হইলেন। ঘুড়ি, সদম্ভে আকাশ-পথে উড়িতেছিল—হঠাৎ কে যেন তাহার সূতা কাটিয়া দিল। ঘুড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিকলাঙ্গ হইয়া, ভূতলে পড়িয়া গেল। মোহনবাঁশী মনে মনে ধবলাগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন, স্থায়ীরূপে বসিবার উদ্যোগে ছিলেন,—কিন্তু পিচ্ছিল পর্ব্বতে বসিতে সক্ষম না হইয়া, ক্রমশঃ গড়াইয়া গড়াইয়া, নাকে মুখে চোকে বুকে আঘাত পাইয়া, ধড়াস্ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার উপর-পাটীস্থ সম্মুখের দুইটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহনবাঁশী, বি, এ,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, সুতরাং বি, এল পাশ দিয়া হাইকোর্টের উকীল হইবেন কিরূপে? মোহনবাঁশী ফেল হইলেন বলিয়া যে, আপন বিদ্যাবুদ্ধির প্রভা কিঞ্চিৎ কম উজ্জ্বল মনে করিতেন,—তাহা নহে। তিনি কাহাকেও বলিতেন,—"পরীক্ষায় পাস হওয়া আর স্ফূর্ত্তি খেলায় অর্থলাভ করা—এ দুইই সমান। এখানে গুণের বিচার নাই। "পড়িল পাশা, তো জিতিল কোদালের বাঁট।" কাহাকেও আবার বলিতেন,—"পরীক্ষকগণ মহা মূর্খ। তাহারা আমার প্রশ্নোত্তরের মহিমা বুঝে না। বানর মুক্তামালার অর্থ কি বুঝিবে?"

মোহনবাঁশী মুখে দড় হইলেও, মনে মনে মনকে বুঝাইয়া এক রকম ঠাণ্ডা করিলেও, হৃদয়ের অন্তস্তলে কিন্তু তিনি নিদারুণ কেমন এক আঘাত পাইলেন। সংসারে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিলেন না,—হাইকোর্টের জজ হইতে সক্ষম হইলেন না,—ইহজগতে সম্মানরূপ সার সুখ পাইলেন না,—কাজেই তিনি ধরাধাম শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মন কেমন 'উদাস' হইল। কিছুই ভাল লাগে না। ক্ষুধাও মন্দ হইয়া আসিল। লোক দেখিলেই,—বিশেষতঃ শ্বশুরবাটীর লোক দেখিলেই,—কেমন এক

অনির্ব্বচনীয় লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি সহজে লোপ পায় না। শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, মোহনবাঁশী সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিলেন। বলিতেন,—"সঙ্গীতের ন্যায় সুখ আর কিছুতেই নাই। সঙ্গীত ব্রহ্ম। সঙ্গীতে একবার মন মজিলে, সংসারের সমগ্র সামগ্রীরই শুভদর্শন হয়। সু-সঙ্গীতে এবং সু-সঙ্গতে পুত্রশোকও তিষ্টিতে পারে না।"

বাবু, মুখে ঐরূপ বক্তৃতা করেন এবং ওস্তাদ রাখিয়া গান শেখেন। কযেক মাস পরে, সঙ্গীতও আর তাঁহাকে ভাল লাগিল না। কেননা, গলায় স্বর তাঁহার আদৌ আসিল না। তালেও তথৈবচ জ্ঞান জন্মিল। ওস্তাদ, তালবোধের কথা বাবুকে বলিলে, তিনি বডই বেজার হইতেন।

সঙ্গীত ছাড়িয়া, অনন্যোপায হইয়া, তিনি শেষে কবিতা-দেবীর সেবা আরম্ভ করিলেন। বলিতেন,—"ধন্বন্তরির কলসের অমৃত, শারদীয চন্দ্রের সুধা, প্রফুল্ল-পঙ্কজের অনাঘ্রাত মধু,—এ সমস্ত কবিতারসের কাছে কিছুই নহে। হাইকোর্টের জজিয়তিপদ পার্থিব, নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর এবং জলবিম্ববৎ; কিন্তু কবিতা-রস পান করিয়া বাল্মীকি অমর, কালিদাস মৃত্যুঞ্জয়, বেদব্যাস চারি যুগেই সমভাবে বর্ত্তমান। বিশেষ হাইকোর্টেব জজ স্বদেশেই পূজ্য; কিন্তু কবি সর্ব্বত্রই সমাদৃত।"

মোহনবাঁশী, মৃত্যুঞ্জয় এবং সর্ব্বত্র পূজিত হইবার জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়াছিলেন, স্বভাব-কবিই শ্রেষ্ঠ কবি। আরও শুনিয়াছিলেন, মহাকবিগণ কখন ভাষার জন্য ভাবিত হন না; শুদ্ধাশুদ্ধ, ষত্বণত্ব হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রতি মহাকবিকুলের দৃষ্টিপাত নাই; তাঁহাদের লেখনী-মুখে যাহা নির্গত হইবে, তাহাই ভাষা, তাহাই শুদ্ধ, তাহাই ব্যাকরণ।

একদিন তালগাছ দেখিয়া মোহনবাঁশী কবিতা লিখিলেন,—

রে তালগাছ! কেন এত লম্বা, যেন প্রেম-কাম্বা,
নাহি কিছু ঢম্বা তব।
দেখি এই আম্বা, ভীত জগদম্বা,
আকাশ স্পর্শম্বা হব॥
নাহি শাখা নাহি প্রশাখা নাহি সখা নাহি বিসখা,
সংসারে দেখি তোর সকলি ফাঁকা।
তোর দোয়ারে নাইক আকা, তোর মাথায় বসি কাক ডাকে কাকা,
যেন মূর্ত্তিমান দুঃখের ছবি আঁকা॥
আমি শুনেছি পুরাণে, নারিকেল গাছ সনে,
আছে তোর মাথা-মাখি ভাব।
সেই তোর কেবা হয়,—সহোদর ভাই নয়?
তোর তাল ভাল কিংবা ভাল তার ভাব?
খর্জ্জর সুপারি, দুই গাছ ভারি,
সম্বন্ধি কি ভায়রা-ভাই বুঝিবারে নারি।
রূপ মনোহারি, যাই বলিহারি,
তাল গাছ কাছে কিন্তু উভয়েরই হারি॥
তাল! তোর নাইক মাতা, নাইক পিতা, মাথায় দিবার নাইক ছাতা,
নহিলে, বর্ষায় এত ভিজিস্ কেন?
তাল! তোব ভাত খাইবার নাই কলাপাতা, পায়ে
দিবার নাইক বুটজুতা,
নহিলে তোর, গোড়ালীতে এত কাদা কেন?
তাল! তোর জমা খরচের নাইক খাতা, শয়নের
তোর নাইক কাঁথা,
নহিলে দিন রাত এত দাঁড়ায়ে কেন?

সত্য করে বল্ রে তাল, কেন তোর এই বদ্‌হাল ?
চোরে কি লুঠেছে তোর সব মালামাল ?
তোব তাল-শাঁসে কি নাইক রস, তাই তুই হয়েছিস্ এত বিরস,
আমি থাক্‌তে দুঃখ কিরে ওরে কানাইলাল ॥

শ্রীমোহনবাঁশী বি-এ-ফেল
(অঙ্কশাস্ত্রে সিকি নম্বরের জন্য)

এই মহাকবিতা প্রকাশিত হইবামাত্র, সমগ্র জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ জগতের অর্দ্ধেক লোক মোহনবাঁশীর "তালগাছ" পাঠে মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গেটে, বার্জিল, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, পাতঞ্জল বা আবুলফজলে এরূপ কবিত্বপূর্ণ পদ্য দেখা যায় না। মোহনবাঁশী বাবু তালগাছ ব্যতীত ইহজীবনে যদি আর একটিও পদ্য না লেখেন, তাহা হইলেও সংসারে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবেন। কোহিনূর হীরক এক খণ্ড মাত্র পাওয়া যায়; সিংহ একটী সন্তান প্রসব করে; মনুমেণ্ট কলিকাতায় একটীই আছে। সার-সামগ্রী পৃথিবীতে একটী করিয়াই হয়। যেমন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।" (পৃ. ২-৭)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০, কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ॥০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশাররফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন (যন্ত্রস্থ)।